



FEBRUARY 21 INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY



আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাৰি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা। অলকনন্দা, যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো স্ক্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রুখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে।

ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অনু, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালানো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সূত্র : আলতাফ মাহমুদ



Commemorating



International Mother Language Day



Artwork courtesy: Joachim Romeo D'Costa.

BAGKC Committee 2012-2014:

President: Dr. Mustafa Kamal Vice President: Nabil Ahmad
General Secretary: Haroon Sattar Assistant General Secretary: Khaled Saifullah
Treasurer: Rehan Reza Cultural Secretary: Sibghat Khan Sports Secretary: Mustafa Sayem
Membership Co-ordinator: Nila Kamal
EC Members: 1) Anis Rahman 2) Showkat Osman 3) Khorshed Alam 4) Aliza Khan

Editor: Haroon Sattar

Disclaimer: The views and opinions expressed in the articles are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of BAGKC or BAGKC Executive Committee.



Message from
Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO,
on the occasion of

International Mother Language Day 21 February 2013

International Mother Language Day is an ideal opportunity to highlight the importance of languages to group and individual identity, as the foundation for all social, economic and cultural life.

Multilingualism is a source of strength and opportunity for humanity. It embodies our cultural diversity and encourages the exchange of views, the renewal of ideas and the broadening of our capacity to imagine. Genuine dialogue implies respect for languages, and this is why UNESCO works to harness their power to foster mutual understanding. We encourage teaching in the mother tongue, which facilitates the fight against illiteracy and contributes to the quality of education. The protection of languages ensures also that rare and indigenous knowledge is safeguarded and handed down. By giving each of us the means to make ourselves heard and be respected, this is also a force for social inclusion.

This year, UNESCO has decided to explore the links between languages and books. Books are a force for peace and development that must be placed in the hands of all. They are also crucial tools for expression that help to enrich languages, while recording their changes over time. In this age of new technologies, books remain precious instruments, easy to handle, sturdy and practical for sharing knowledge, mutual understanding and opening the world to all. Books are the pillars of knowledge societies and essential for promoting freedom of expression and education for all.

The vitality of languages depends as much on oral exchange as on the large-scale production of teaching material and printed texts. In some countries, the dearth of books and textbooks in local languages hampers development and social inclusion and represents a violation of the right to freedom of expression. Digital tools can help to fill this gap, but they are not enough. We must do more to distribute materials and books as widely and fairly as possible, so that all people – children above all – can read in the language of their choice, including in their mother tongue. This can also boost progress towards the Education for All goals by 2015. Translation is an important part of this great project, by creating bridges to new readers.

On this 14th International Mother Language Day, I call on all UNESCO's partners, authors and teachers all over the world, in universities, the UNESCO Chairs and Associated Schools to work together to promote the importance of linguistic and cultural diversity and of education in the mother tongue.

Irina Bokova

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। ভাষা আন্দোলন বা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করার দিন হিসাবেই সবাই জানি। আমি মনে করি এদিনের গুরুত্ব আরও অনেক গভীরে প্রোথিত। বাঙ্গালীদের একটা বদনাম ছিল ভীরা হিসাবে। ঐ দিন বাঙ্গালীর রক্ত দিয়ে প্রথমবারের মত প্রমান করে গেল, বাঙ্গালীরা ভীরা নয়। নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ে বুকের রক্ত দিতে তারাও করো থেকে কম যায় না। সেই জন্যই ২১ ফেব্রুয়ারী শুধু ভাষা আন্দোলনের নয়, জাগরণের দিনও বটে। তাইত যখনই জাতীয় বা জনগনের স্বার্থের উপর আঘাত আসে, তখনই ২১ আমাদেরকে অনুপ্রেরনার যোগায়, ছুটে যাই ২১ শের কাছে।

যতদুর মনে পড়ে, আমি তখন থামের প্রাইমারী স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। ২২ ফেব্রুয়ারী হতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা সবাই স্কুলে হাজির হয়ে ক্লাশ না করে পাট খড়ির মাথায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ছাপানো ছোট ছোট পতাকা নিয়ে থামের রাশয় রাশয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'নুরুল আমিনের কল্লা (মাথা) চাই' এমন সব শ্লোগান দিতে দিতে আমাদের স্কুল হতে ৩ মাইল দূরে হাইস্কুল মাঠে একত্রিত হতাম। সেখানে কলেজ হতে আশা ছাত্র নেতারা বক্তৃতা দিত। কথাটা এখানে উল্লেখ করলাম এজন্য যে, এখনকার মত ঐ আন্দোলন শুধু শহরভিত্তিক ছিল না। ঐ আন্দোলন ছিল সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একাত্মতা প্রকাশেরও আন্দোলন।

আমি মনে করি, ২১ শের আন্দোলনই ছিল পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভিত্তি। অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার এর বিরুদ্ধে; আর ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামের সকল অনুপ্রেরনার শক্তি হল ২১। এ আন্দোলনের কি ইতি ঘটেছে? আমার উত্তর 'না'। এ আন্দোলনের ইতি আদৌ কোনদিন ঘটবে কিনা, তাতে আমি যথেষ্ট সন্দেহান।

স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর হতে চলল। এর মধ্যেতো কোন সময়েই জনগন প্রকৃত স্বাধীনতার সুফল দেখতে পায়নি। অত্যাচার, লুণ্ঠন, নিপীড়ন হতেতো জনগন নিষকৃতি পায়নি? শাসক বদলেছে, কিন্তু শাসকের চরিত্র একটুও বদলায়নি। বরঞ্চ অত্যাচার, লুণ্ঠন, নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৌশল বদলাচ্ছে শাসক গুষ্ঠি।

এর শেষ কোথায়? অদূর ভবিষ্যতে বদলানোর কোন লক্ষণও প্রতিভাত হচ্ছেনা। তবে কি বসে বসে শুধু নিষ্পেশিত আর লাঞ্চিত হতেই থাকবে জনগন? ২১ শের উদ্দীপনায় আবারও ঐকবদ্ধভাবে কি আন্দোলনের জন্য জেগে উঠবেনা জনগন? আমার বিশ্বাস উঠবে। তবে তা যত তাড়িতাড়ি হয়; দেশ, জাতি ও জনগনের ততই হবে মঙ্গল।

মুখে শুধু একুশের চেতনার কথা বলা নয়, আসুন আমরা সবাই একুশের চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে কাজের মধ্য দিয়ে বাস্বায়নের উদ্দেশ্যে সকল অন্যায়, অত্যাচার আর জুলুমের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একুশ হতে অনুপ্রেরনা গ্রহন করি।

ঐ দিন জাতীয় ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ যেন তাঁদেরকে শহীদের মর্যাদা দেন সে দোয়া করি।



Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO

একুশ মাথা উচুঁ করে দাঁড়ানোর চেতনা

প্রফেসর ড. জসীম উদ্দিন আহমদ

একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের অন্যতম শোক ও জাতীয় দিবস। আজ থেকে ৬১ বছর আগে ১৯৫২ সালের এই দিনে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিকসহ আরও কয়েকজন। তাঁদের আত্মহত্যার জন্যই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ইঙ্গিত লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছিলো। মাতৃভাষাকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে আত্মহত্যার ইতিহাস, শহীদ হওয়ার ইতিহাস এর আগে বিশ্বের আর কোথাও ঘটেনি। এজন্যেই একুশ আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। একুশ সব সময়ই আমাদের চেতনার পরতে পরতে সংগ্রামের অনুরশন জানায়।

২০০০ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বিশ্ববাসী মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানতে পারবে-জাতি হিসেবে আমরা আরও গৌরবান্বিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। একুশের প্রথম প্রহর থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও আজিমপুর কবরস্থানে যেখানে ভাষা শহীদরা অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন সেখানে আবাল-বৃন্দ-জনতা শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সমবেত হতে থাকে।

১৯৫২ এর পর খুব ছোট যখন ছিলাম, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময়ও ২১ ফেব্রুয়ারীতে ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’ শ্লোগান দিয়ে গ্রামের মেঠো পথ ও শিবপুর বাজার ঘুরে বেড়িয়েছি। ষাটের দশকেও যখন একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হত না তখনও আমাদের শাণিত চেতনায় সম্মিলিত প্রয়াসে একুশে ফেব্রুয়ারি খুবই ভাবগভীর পরিবেশে পালিত হত। অনেক বাধা ও বিপত্তি আমাদের কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আমি ১৯৬৫ সালের শহীদ দিবসের একটি কর্মসূচির উল্লেখ করবো।

১৯৬৫ সালে আমি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক। প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ তখন ঢাকা কলেজের জাঁদরেল অধ্যক্ষ। কোনো আন্দোলন ও সংগ্রামে জড়িত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ‘বহিষ্কার’ বা কলেজ পরিবর্তন সার্টিফিকেট দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তখন একের পর এক রেকর্ড গড়ে তুলছেন। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন জননির্নিত গভর্নর মোনায়েম খানের সাথে তার সম্পর্কেও কারণে সবাই তাকে সমীহ করে চলতেন।

আমরা ছাত্র সংসদে সিদ্ধান্ত নিলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টায় আমরা কলেজের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পর আজিমপুর কবরস্থানে যথেষ্ট পাঠ করতে যাবো। খবরটি যথাসময়ে চরের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট পৌঁছে যায়। তিনি আমাদেরকে তলব করলেন। তার অফিস কক্ষে ছাত্র সংসদের সভাপতি হিসেবে তিনি সভায় সভাপতিত্ব করলেন। ছাত্র সংসদের উপদেষ্টা প্রফেসর নোমানকেও সভায় আমন্ত্রণ জানানো হলো। অধ্যক্ষ সাহেব আমাদের কোনো কর্মসূচি আছে

কিনা জানতে চাইলেন। আমরা সবাই বিনীতভাবে আমাদের সকালের কর্মসূচির কথা জানালাম। আমাদের কর্মসূচি জানার পর কিছুক্ষণ তিনি গভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন যে, তিনি ওইদিন তার বিশেষ ক্ষমতা বলে কলেজ বন্ধ রাখবেন, আমরা কয়েকজন সকালে কলেজ শহীদ মিনারে ফুল দিতে পারবো তবে কলেজের প্রধান গেট বন্ধ থাকবে, ইচ্ছে করলে আমরা পেছনের কোনো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আজিমপুরে যেতে পারবো। আমরা অনুরোধ জানালাম ছাত্র সংসদের সভাপতি হিসেবে তিনি যেন সকালে আমাদের সাথে কলেজ শহীদ মিনারে উপস্থিত থাকেন। এর জবাবে তার রক্তচক্ষুর নীরব তাড়া খেয়ে আমরা সভাকক্ষ ত্যাগ করি।

২০ ফেব্রুয়ারি আমরা ছাত্র সংসদের অফিসে বসি। সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনই ক্যান্সাসের বাইরে থাকেন বলে আসতে পারবেন না জানান এবং ছাত্রাবাসে থাকার জন্য আমার ওপরই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে, আমিও গর্বিতাচিন্তে রাজি হই। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ছাত্রাবাসের ৮/৯ জন ছাত্রসহ আমি কলেজ শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসি। আসামাত্রই অধ্যক্ষ সাহেবের প্রিয় পিয়ন এসে জানালো এখানে ফুল দিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমিও বললাম ছাত্র সংসদের সভায় অধ্যক্ষ স্যারের সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে ফুল আমরা দেবোই। কথা কাটাকাটির মাঝেই অধ্যক্ষ সাহেব লুপ্তি পরেই হাজির হলেন। তিনি এসেই বললেন, ‘কে ফুল দিতে চাও-সামনে এসো।’ আমি সামনে এগিয়ে বললাম, ‘স্যার আপনার সভাপতিত্বেই তো সিদ্ধান্ত হয়েছে।’ তোমাদের যা ইচ্ছা কর বলে তিনি চলে গেলেন। আমরা যথারীতি আমাদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পর আজিমপুরে যেতে গিয়ে দেখি কলেজের ছোট-বড় সব গেট তালাবদ্ধ। ওইদিন আমরা দেওয়াল ডিঙিলে বের হয়ে প্রথমে আজিমপুর কবরস্থান ও পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়েছিলাম। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি আর বিশ্বাসে অটল ছিলাম বলে আমাদের কর্মসূচির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছিলাম।

এর ২/১ দিনের ভেতরই আমাদের কয়েকজনের নামে কলেজ শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছিল। মরহুম প্রফেসর নোমান বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়ায় আমরা বহিষ্কার বা কলেজ পরিবর্তন সার্টিফিকেটের খড়গহস্ত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। পরে জানতে পারি অধ্যক্ষ সাহেব গোপনে হুমকি দেয়ায় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সম্পাদক ঐ দিন সকালে কলেজে আসিনি। আজও ২১ আমাদের সংগ্রামী চেতনাকে শানিক করে। আমাদের নতুন প্রজন্ম, তরুণ প্রজন্ম একুশের চেতনা বুকে ধারণ করে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে একটি ‘মাথা উচু জাতি’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

Ekushe Padak 2013

The recipients of Ekushey Padak 2013: **MA Wadud** (posthumous), **Prof Ajit Kumar Guha** (posthumous), **Principal M Quamruzzaman** (posthumous) and **Tofazzal Hossain** for Language Movement; **Enamul Haque. Mostafa Shahid** for Liberation War; **Nurjahan Murshid** (posthumous) and **Samson H Chowdhury** (posthumous) for Social Services; **Rafiq Azad** and **Asad Chowdhury** for Language and Literature; **Kaderi Kibria, Jamaluddin Hossain, Bijoy Krishna Adhikari** (posthumous) and **Bangladesh Udichi Shilpi Goshti** for art and culture.



Architecture of Shaheed Minar

1952-1983



1952 First Shaheed Minar. Built on Feb 22-23, 1952 the monument was demolished on February 26, 1952.



Hamidur Rahman

1928-1988

Hamidur Rahman was born in Dhaka in 1928. He received his art education in Bangladesh College of Arts and Crafts, Dhaka (1948-50), Ecole des Beux Arts, Paris (1950-51) and Central School of Art and Design, London. He attended a summer course in mural painting at the Academic de Belle Art in Florence, Italy in 1953. Later, he worked as a research scholar in Pennsylvania Academy of Fine Arts at Philadelphia, USA during 1958-59. Hamidur Rahman took up art teaching alongside his more substantive work as a painter. He was a professor of fine arts at McDonald and Cartier Polytechnic at Montreal, Canada

During the language movement of 1952, Rahman played the leading role in creating a design for the shaheed minar that, in its essential simplicity, is poignantly evocative of the passion of the Bengali nation. Rahman also did some murals for the Minar that narrated the history of the struggle for identity of the nation. In this, and many other murals he did at home and abroad (a total of 11000 square feet of wall-space), Rahman's interpretation of traditional icons and images is strikingly crisp and free-floating, although their architectonic quality finally anchors them to familiar space and ground. The more celebrated of his murals are Borak Dudul, Fishermen's Village and Boat Composition that were done in 1957-58 for the Public Library.

Essentially cubist in conception, Rahman's approach to art, nevertheless, steered clear of any recognized exercises - cubist or otherwise. The first exhibition of his abstract paintings in 1956, for example. He accommodated half-realistic figures within a formal

arrangement that aimed at abstraction. His style blends elements from different traditions, but all the while he attempted to radically locate both himself and his art in their constantly evolving contexts. Hamidur Rahman died in 1988.

Source: [Sved Manzoorul Islam] Banglapedia. Shaheed Smriti Sinombho. February 1993



1953-56. Second Shaheed Minar. February 21, 1956. Paying tributes to martyrs of language movement



1963-71 Third Shaheed Minar. February 21, 1971
Designed by sculptor Hamidur Rahman the construction of third Shaheed Minar began in 1957. It was inaugurated on February 21, 1963.



March 1971, people showing solidarity with Independence movement at Shaheed Minar.



Shaheed Minar was destroyed by Pakistan Army in March 1971. Pictures shows victorious Mukti Joudha on the podium of Shaheed Minar, December 1971.



1972-74 Fourth Shaheed Minar. Shaheed Minar was reconstructed at its original location. Proportions and size of Shaheeddd Minar were however different from the original monument. In 1983 expansion of shaheed minar premises, landscape and realignment of streets were carried out to its current condition.



1969 Mass uprising against the autocratic government. Sit-in strike at Shaheed Minar.

What Ekushe February Means to Me

Mustafa A. Kamal, Ph.D. Warrensburg, Missouri

My observation of Ekushe February has changed over time.

As a kid in school, I always thought it was a celebration of something that only grownups really understood. Stealing flowers from our neighbor's gardens, hanging out with other friends in bunch to build make-shift Shaheed Miner and taking orders from big brothers and big sisters to run errands were the main highlights for the night before. For me it was a festival; I was allowed to stay up till midnight. The daybreak brought newer excitements, music, processions and more flowers. My parents wanted to make sure that I was safe. To that end, a big brother from the neighborhood was assigned responsibility that I didn't get lost during mile and half walk to Azimpur graveyard. How he was picked, I later found out, but that is a story for another day. The part of the long procession I didn't like was the concept of walking bare feet. I didn't appreciate people stepping on my feet. I would return home in the afternoon, tired, hungry and exhausted. That was my run till I started high school.

My high school days at Govt. Laboratory were often turbulent, mainly due to the close proximity of some of our current national leaders who were then at the forefront of student politics. Their fierce politics at Dhaka College and Eden Girl's College, made our school life often miserable and tense. While at Dhaka College, I realized that my body chemistry has changed, and my testosterone level was shooting through the roof. Ekushe February morning trip to the same Azimpur graveyard, brought new social excitement to the equation. Exhilaration of the sights and sound for me brought a sense of excitement to the somber occasion. By then I had acquired additional freedom to stay late in the night, out in town. I knew that I was changing and was learning newer things.

Life in Dhaka University Curzon Hall brought a new side to the Ekushe February that I didn't realize before. By this time, I considered myself mature, keen in gathering knowledge and more understanding on life issues than many. My fixation on many social opportunities made me calmer. I read about the historical background leading up to 1952 language movement, its' leadership and organization. Besides my academic Physics, I started reading Bengali literature, beyond Rabindranath and Kazi Nazrul. Writings of Ishwar Chandra Bandyopadhyaya, Michael Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chattopadhyay, Biharilal Chakraborty, Kaykobad, Romesh Chunder Dutt, Mir Mosharraf Hossain, Jinabannanda Das intrigued me. Although many of these writings, I didn't completely comprehend, I understood the richness, diversity, and enormity of its impacts on the lives of people of Bengal and East Pakistan (Bangladesh). For the life of me, I couldn't comprehend what drove Mr. Jinnah to deny Bengali its national language status. For the first time in my life, Ekushe February brought a new meaning, a wider realization that 1952 language movement was much bigger than what people around me think of. My Dhaka University life, from 1970 freshmen year to M.Sc were explosive, to say the least. My generation contributed dearly to the emergence of Bangladesh and many paid the ultimate price.

1974-75 was a turbulent time for my conscience. Being at the top of my class and recipient of highest Dhaka University academic recognition as Raja Kalinarayan Scholar, didn't translate into opportunities for me. Now, I wanted to wait and experiment. A graduate research assistantship offer from University of Oregon landed me in the lush green Williamate Valley and changed my state of despair to opportunities. Here, the first time in my life, on a global stage, Ekushe February, the Language Movement of 1952 brought a different realization to my existence. On my first Eid-UI-Fitr celebration that evening of fall 1975, I discovered who I was, what was my true identity. I saw the Druze Christians and Lebanese Muslim hug each other, exchange greetings, I found Palestinian Muslims and Christians talk about their troubled land, I discovered South American Muslims congregate around their language, rather than nationality, I discovered north African Arabs and middle east Arabs, call each other brothers, despite religious differences. Several Pakistani Muslims, who called me 'brother' and started to talk in Urdu were disappointed to realize that I neither understood nor could speak in their language. To my inquiry, if they understood and could speak in Bangla, I saw surprise in their eyes; they didn't see relevance of my question. Walking home that crisp Autumn night, I realized for the first time that my language and culture defines who I am.

And surely, it does. A person's language and culture defines who he/she is. It adds value, depth of appreciation for beauties in life, it adds character to one's existence.

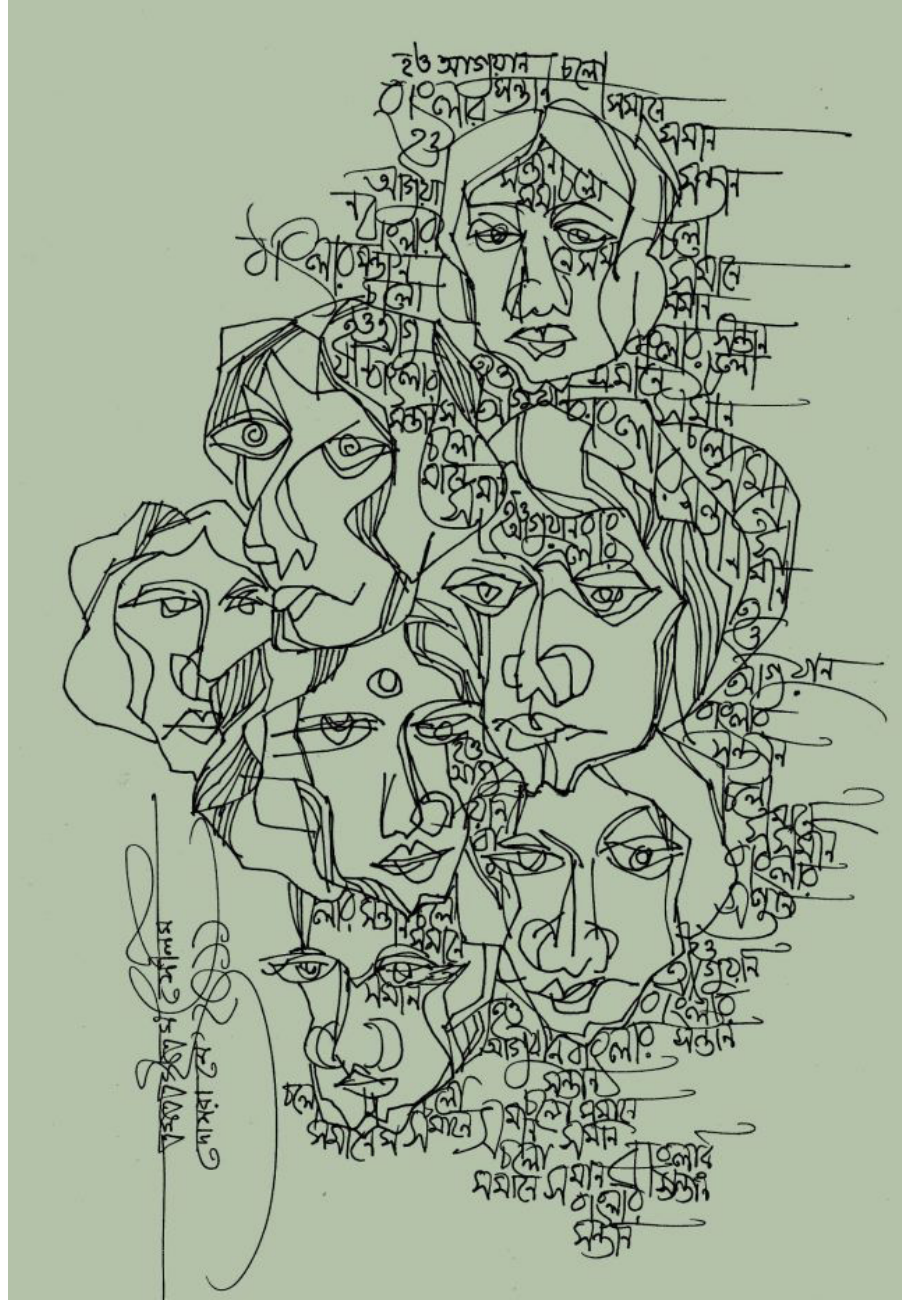
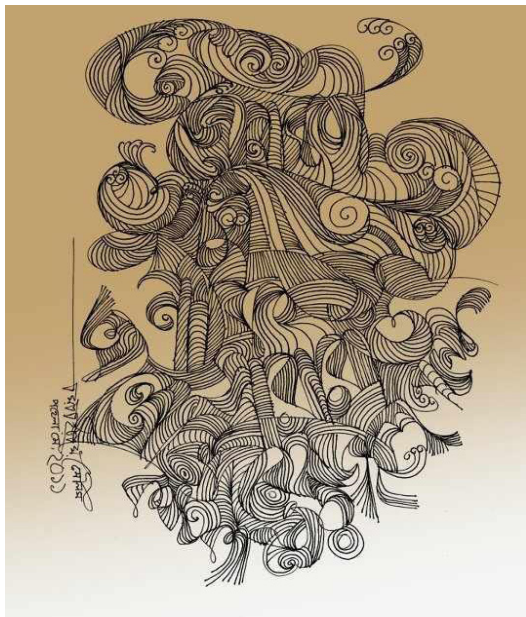
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতো ঝড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি - চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ; - [জীবনানন্দ দাশ](#)

জোছনা করেছে আড়ি,
আসেনা আমার বাড়ি।

গলি দিয়ে চলে যায় লুটিয়ে রূপোলি শাড়ি – [কাজী নজরুল ইসলাম](#)

Every time I hear Bangla melody, I close my eyes and feel my heart and I smile. I am Ekushe February.

Calligraphy Word Art by **Anwar Selim**, Dhaka Bangladesh.



একুশ আমাদের অহঙ্কার, একুশ আমাদের চেতনা

- মুনিম হোসেন

অখ্যাত এক কবিতার শেষ দুটি লাইন দিয়ে শুরু করছি,

“একুশ তুমি আবার এসেছো ফিরে বাংলার ঘরে,

নতুন আশা জাগুক বাঙ্গালীর অন্তরে।“

একুশের সাথে আমার পরিচয় এভাবেই। সেই পাঁচ বছর বয়সে শোনা কবিতাটি এখনও মনে পড়ে। একুশকে নিয়ে এই কবিতাটি লিখেছিল আমার বড় ভাই, যখন তার বয়স ছিল দশ। মানুষের ছোটবেলার স্মৃতিগুলি সম্ভবত কখনই মুছে যায় না। কিছু লিখব বলে যখন ঠিক করলাম, একুশকে ঘিরে অজস্র স্মৃতির সেই দিনগুলিতে বারবার ফিরে গেলাম। আবিষ্কার করলাম ধাপে ধাপে গড়া স্মৃতির এক জগত, যা এই লেখায় সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কিছু উল্লেখযোগ্য টাইমলাইনঃ

- শহীদ মিনারকে প্রথম কাছ থেকে দেখা – আট বছর বয়সে, আন্নার হাত ধরে।
- স্কুলে ও পাড়া মহল্লায় একুশের অনুষ্ঠান – হাইস্কুলের দিনগুলিতে।
- নিজ থেকে প্রথম বইমেলায় যাওয়া – দশম শ্রেণীতে।
- বন্ধুদের সাথে একুশের প্রভাতফেরী – কলেজের ছাত্রাবস্থায়।
- বন্ধুরা মিলে বইমেলায় স্টল দেয়া – বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বর্ষে।
- শাহবাগ আজিজ মার্কেটে আড্ডা – লেখক বন্ধুদের সাথে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে।

আমি নিশ্চিত, এই স্মৃতির জগত আপনাদেরও অতি পরিচিত। এই যে সময়গুলির কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে ঘিরে রয়েছে অজস্র স্মৃতি যা এখনও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। ছোটবেলায় যখন ‘আমার ভাইএর রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী’ গানটা শুনতাম, মনে মনে একটা কল্পিত দৃশ্য তখন ভেসে উঠত। মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, সফিউর, আর নাম না জানা শহীদ ভাইদের কথা মনে করে। পরবর্তীতে জেনেছিলাম, এই গানটির সুরকার, আলতাফ মাহমুদকে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। যিনি আর ফিরে আসেননি। উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, আমাদের বাঙ্গালী জাতির কোন অর্জন এমনি এমনিই হয়ে যায়নি। কিন্তু তখন পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু পড়া হয়ে উঠছিল না আর বাংলা বিষয়টির সাথে একটু দূরত্বও তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

সেই বাংলাকে প্রথম খুব কাছে নিয়ে আসলেন আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশ বিদেশের নানা বই পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। আরও একজন বাংলা শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ স্যার, যিনি অত্যন্ত যত্ন করে ‘লালশালু’ উপন্যাসটি পরিিয়েছিলেন। এই দুই মেধাবী বাংলা শিক্ষককে পেয়েছিলাম ঢাকা কলেজে, যেখানে উনাদের ক্লাসগুলিতে ছাত্রদের উপস্থিতি থাকতো চোখে পড়ার মত।

কলেজ থেকেই একুশের বইমেলায় নিয়মিত যাওয়া হয়েছে সদলবলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাস শুরুর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার সময়ে (১৯৯৪ সাল) অতি উৎসাহে আমরা হটাত করেই বইমেলাতে স্টল দিয়ে ফেলি। ফলে, ওই বছর প্রতিদিনই বইমেলাতে কাটিয়েছি। স্টল দেয়ার কারণে পরিচিত হয়েছি বহু মানুষের সাথে, চিনেছি অন্য এক জগতকে। বিকাল বেলা বাইরের স্টলগুলো থেকে বাজানো হতো কবিতা আবৃত্তির ক্যাসেট। শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কেউ কথা রাখেনি’, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ’র ‘কিংবদন্তীর কথা’, হেলাল হাফিযের ‘কষ্ট’, রফিক আজাদের ‘ভাত দে’, এখনও যেন কানে বাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে এসে লেখক বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝে আজিজ মার্কেটে যাওয়া হতো। তখনকার উদীয়মান লেখকদের আতলামিতে যোগ দিতে না পারলেও আড্ডাটা বেশ উপভোগ করতাম। সেই বন্ধুদের কেউ কেউ এখন সুপরিচিত লেখক, সুস্থ ফিল্ম নির্মাতা এবং সুরকার, যারা দেশকে সুন্দর কিছু উপহার দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন উপলব্ধি করি, আমাদেরকে খুব যত্ন করে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশের সাথে। তাই গভীরতম শ্রদ্ধা জানাই তাদের, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, নিজের জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

এখন ফিরে আসি আমাদের এই প্রবাস জীবনে। দূরদেশে থাকলেও আমাদের সবার মনেই রয়েছে নিজের দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা। অন্যদিকে প্রবাস জীবন থেকে আমরা অর্জন করছি কর্মদক্ষতা এবং নানা ধরনের অভিজ্ঞতা। তাই আমাদের নিজেদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে, আমরা কিভাবে আমাদের চিন্তা, চেতনা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো যা থেকে উপকৃত হবে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ। মনে রাখতে হবে, সুস্থ চেতনাবোধ থেকে যে সৃষ্টিশীলতার জন্ম নেয় তার বিস্তার হয় বহুমাত্রিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী ১০-১৫ বছরে আমরা একটা পরিবর্তিত বাংলাদেশ দেখব, ইনশাআল্লাহ। কে জানে, সেই পরিবর্তিত বাংলাদেশ-ই হয়ত আমাদের অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুলে দিবে অন্য কোন সম্ভাবনার দুয়ার! তাই একুশ হোক, চেতনার চলমান ধারা আর সম্ভাবনার সেতুবন্ধন।

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 21 FEBRUARY 2012



Learning in a language they can understand is vital for children to enjoy their right to quality education. Mother Tongue and Multilingual Education are key to reducing discrimination, promoting inclusion and improving learning outcomes for all.

www.unesco.org/education



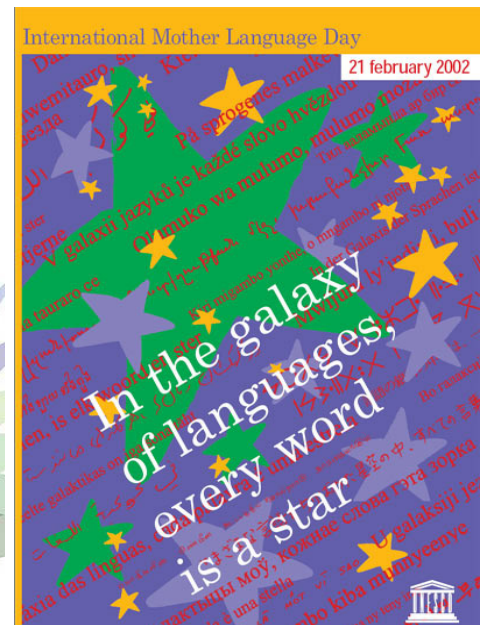
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

International Mother Language Day
21 February 2011

Mother



Language



ভাষাভিত্তিক স্বকীয়তা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শাহ মুমিন

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ভাষাভাষী জনপদ গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় আর সমতটে বিভক্ত ছিলো। একাদশ শতকে মুসলিম আগমনের পর, স্বাধীন সুলতানরা বাংলা শাসন করেছেন বিভিন্ন মেয়াদে। তারা ফার্সীভাষী হলেও বাংলার সমাদর ছিলো সর্বত্র। দ্বাদশ ভুঁইয়ার পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে, মহামতি জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর বাঙলাকে একটি প্রদেশে (সুবা) রূপান্তরিত করেন।

যে মোগলদের প্রতাপে আসমুদ্রহিমাচল বাঘে মোষে একঘণ্টে জল খেতো, তাদের উত্তরসুরিরা বিলাসিতায় গা ভাসালে, স্বাধীন নবাবদের উত্তরন ঘটে। তারপর পলাশীর আত্মকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর, বিলাতী বেনিয়াদের শাসনে তখনই হয় বাংলার মাঠঘটা। শতবর্ষ পরে, ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় বাংলায়। পরাজয়ের পর, বাহাদুর শাহ জাফর সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল আর প্রিয় নাতনি শাহজাদী রওনক জামানীকে নিয়ে বার্মায় নির্বাসিত হন।

আবারো প্রায় শতবর্ষ অপেক্ষা করতে হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য। ইতোমধ্যে গঙ্গা যমুনার অনেক জল বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। রক্ত দিয়েছে হাজারো মানুষ, নির্যাতিত হয়েছে অগণিত আবালবৃদ্ধবনিতা।

উনবিংশ শতকের শুরুতেই বাংলা রেনেসাঁর অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন হেনরি ডিরোজিও, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। কোলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের গদ্যধারা প্রচলনসহ আধুনিকতার ছোঁয়াচ আনেন। বাংলা কাব্য পরিপূর্ণ আধুনিকতা পায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মানসে ‘বিষবৃক্ষ’ রোপন করলেও তার হাতেই আধুনিকতা আসে বাংলা উপন্যাসে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে নিয়ে যান বিশ্বসভায়। কাজী নজরুল ইসলাম আসেন ঝড়ের বেগে, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের মহান বানী নিয়ে। তার লেখনী আগুন ধরায় বাঙালী মানসে, নিষিদ্ধ হয় তার কাব্যগ্রন্থ, “আনন্দময়ীর আগমনে” লিখে তাকে যেতে হয় জেলে।

বাংলা রেনেসা থেকে শুরু করে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ রহিতকরন, অগ্নিযুগের বিপুবীর্য বৈশিষ্ট্যই এসেছেন বাংলা থেকে। প্রান দিয়েছেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে প্রান দিয়েছেন মাস্টারদা সুর্যসেন,

অগ্নিকন্যা পীতিলতা। তীতুমীরের বাশের কেল্লা থেকে শুরু করে নীলকর বিদ্রে হ, তেভাগা আনেদালন, গারো বিদ্রোহ, ফরায়েজী আনেদালন, স্বদেশী আনেদালন: কতইনা দেখতে হয়েছে এদেশের মানুষকে। ভারতীয় রাজনীতির পুরোধার অনেকে এসেছেন বাংলা থেকে: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

শেরেবাংলা ফজলুল হক যখন ভারতবর্ষের মুসলিমপ্রধান পূর্ব এবং পশ্চিম অংশসমূহ নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন, সেখানে এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা ছিলোনা। ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পূর্বে সেই পরিবর্তন আসে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দেশ বিভাগের রাজনীতিতে পূর্ববাংলার নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আশা আকাংখার প্রতিফলন ছিলো। বাংলা ছাড়া ভারতের আর কোথাও মুসলিম লীগ ক্ষমতায় ছিলোনা। বাঙালিদের ছাড়া সেদিন পাকিস্তান প্ তিষ্ঠা সম্ভব হতো না।

রাজনীতির বাইরে বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের বেশিরভাগই ছিলেন বাংলাকে একত্রিত রাখার পক্ষে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো অসাম্প্রদায়িক আর সেকুলার মানুষ ভূ-ভারতে আর জন্মাননি। তিনি তখন দৈনিক নবযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। শেরে বাংলা লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করলে নজরুল এক সম্পাদকীয়তে এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন:

“জিননার প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় তাহা হইলে তেমন ক্ষতি নাই। কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত এই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের বীজ হইতে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যযুগীয় দেশগুলির অনুকরণে যে গৌড়া ধর্মীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইবে, তাহার চেহারা কল্পনা করিতেও আমার ভয় পাইতেছে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে না, হইবে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সর্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ একটি মধ্যযুগীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র -- এই সতর্কবাণীটি আমরা আগেভাগেই উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি।” নজরুল আরো বলেন, “ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মোল্লাতন্ত্রের দেশে আপনি বাঙালির সেকুলার ভাষা-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবেন কিভাবে? না কি উর্দু ফার্সির ছুরিতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জবাই হতে দেবেন?”

সেই সময় মিশরের হাসান আল বান্নার অনুকরণে মাওলানা মওদুদী জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু তিনি ছিলেন ভারত বিভাগের বিপক্ষে। মওদুদীর ওয়াহাবী মতবাদের কঠোর প্রতিপক্ষ ছিলেন দেত্তবন্দপন্থী উলামারা, যাদের অগ্র ভাগে ছিলেন সৈয়দ আহমদ মদনী। তারাও ছিলেন দেশ বিভাগের বিপক্ষে।

ভারতবিভাগের লড়াইয়ে রাজনীতিবিদরা জয়ী হন। শ্রীহট্ট অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে আসামের অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্ববাংলার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। সিলেট রেফারেন্ডামে যোগ দেন ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধুসহ অনেকে। সিলেটের একটি অংশ (কাছাড়, করিমগঞ্জ) আসামের সাথেই থেকে যায়। কোলকাতা দাংগা বাংলাকে একত্রিত রাখা অসম্ভব করে তোলে, যদিও শরৎ বসু এবং হাসান সোহরাওয়ার্দী শেষ চেষ্টা করেছেন।

কাজী নজরুলের ভবিষ্যতবানী যে কতটা সত্য ছিলো তা অনুধাবন করার জন্য বাঙালিকে বহরখানেক অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৪৮ সালেই জিননা ঘোষণা করে বসেন উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা। সেখানেই পাকিস্থান রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘন্টা বেজে যায়। উর্দু পাকিস্থানের কোনো অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা ছিলোনা। উর্দু একটি আর্টিফিসিয়েল ভাষা যা কবি আমির খসরু উদ্ভাবন করেছিলেন আরবী হরফে হিন্দি লেখার জন্য। দেশবিভাগের পর ভারতফেরত মোহাজের আর বিহারীরা তা পাকিস্থানে নিয়ে এসেছিলো।

জমিদারশ্রেনীর অত্যাচারজর্জিত মানুষ ভেবেছিলো রাতারাতি তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে কিন্তু তার বদলে নব্য বুর্জোয়া শ্রেনীর উৎপত্তি হলো। হিন্দু জমিদার আর মধ্যবিত্তরা ভারত চলে গেলে সেই স্থান দখল করে মুসলিম লীগের চেলাচামুন্দারা। একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিকাশ ঘটায় সময় হয়নি। পানজাবী সিভিল মিলিটারী কোটারী বাঙালী অফিসারদের কখনোই শীর্ষে উঠতে দেয়নি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজনীতিও পানজাবী কোটারীদের নিয়ন্ত্রনে ছিলো। তাই সোহরাওয়ার্দীর বদলে তার বেছে নেয় খাজা নাজিম উদ্দিনের মতো অথর্বকে। পরবর্তীতে আজম খানের বদলে বেছে নেয় আইয়ুব খানকে।

তারপর যখন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ভাষার উপর চূড়ান্ত আঘাত আসে, বিক্ষোভের ঘটে সারা বাংলাদেশে। এই বিক্ষোভ ছিলো পুঞ্জিভূত ক্ষোভ

আর আশাভঙ্গের বেদনার। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের কবর রচিত হয়। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে। পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানী চীনপন্থীদের নিয়ে ন্যাপ করে বেরিয়ে যান ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের তাত্ত্বিক বিভক্তি এদেশের স্বাধীকার এবং স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করেছে।

সাম্রাজবাদের প্রতিভু পানজাবীরা ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে বাঙালিকে চিরপদানত রাখার অভিপ্রায়ে। কি না হয়েছে এদেশে: পূর্ববাংলাকে পূর্ব পাকিস্থানে রূপান্তর, আরবী হরফে বাংলা লেখার আয়োজন, রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের চেষ্টা, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বাধা, নজরুলকে ইসলামীকরণের অপচেষ্টা। সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ এর মতো শক্তিশালী সাহিত্যিকরাও এর সাথে যোগ দিয়েছেন।

১৯৬২ সালের ছাত্রআন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গন আন্দোলন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর ভাষাভিত্তিক জাগরণের সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্গবন্ধু একযুগ কারাঅন্তরালে কাটিয়ে, আপোসহীন সংগ্রামশেষে এদেশকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। সেই প্রস্তুতি এসেছে ধাপে ধাপে। তারপর ৭ই মার্চের দিকনির্দেশনা আর ২৬শে মার্চে তার স্বাধীনতা ঘেষনায় চূড়ান্ত পরিনতি পায় বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের।

বঙ্গবন্ধু কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাননি। সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতার যা করার তিনি তাই করেছেন। ভারতের সাথে আগেই যোগাযোগ করে সব ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার অবর্তমানে তাজউদ্দিন আহমদের যোগ্য নেতৃত্বে আর জেনারেল ওসমানীর তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

আমার পিতা স্ত্রীপুত্রকন্যাকে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছেন যুদ্ধে, ৯ মাস কোনো খোজ খবর ছিলোনা। একরকম লক্ষ লক্ষ যুবক যুদ্ধে গেছেন, জীবন দিয়েছেন। ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন, আড়াই লাখ মা-বোন দিয়েছেন তাদের ইজ্জতের দাম। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে জামাতের আলবদর বাহিনী। আর এইসব ধর্মব্যবসায়ীরাই মাওলানা আললামা নামে এখনো আশ্রয়লন দেখাচ্ছে। এরা ইসলামকে কলুষিত করেছে। এরা মুসলিম তো

নয়ই, এরা মানুষেরও অধম। ভাষাসেনিক গাজিউল হক যথার্থই বলেছেন, “আমি যাকে তাকে মাওলানা বলি। বাংলাদেশে মাওলানা দুইজন: একজন মাওলানা ভাসানী, অন্যজন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ।”

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন বলেই অনেক মেজরের জেনারেল হবার সুযোগ হয়েছিলো, অনেক আমলা হতে পেরেছিলেন সচিব উপসচিব। অথচ আজকাল এদের অনেকেই শেখ সাহেবের নামের আগে বঙ্গবন্ধু বলতে যে কুন্ঠাবোধ দেখান, তা ভাসুরের সামনে অপ্রস্তুত ভদ্রবধুর লাজকেও হার মানায়।

শঠ পরিবৃত্ত বঙ্গদেশে তস্করের অভাব হয়নি কোনোকালেই। ১৭৫৭ সালে দেখেছি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ঘষেটি বেগমের দেশ বিকিয়ে দেবার চালা। এই মীরজাফরের উত্তরসুরীরাই ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে বাহাদুর শাহ জাফরের সাথে বেইমানী করেছে পানজাবী আর গোর্খাদের নিয়ে। তারাই আবার নতুন রুপে আবির্ভূত হয়েছে ১৯৭৫ সালে: মুশতাক, ওবায়দুর রহমান, ঠাকুর, চাষী, ফারুক, রশিদ নামে। হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান এবং ক্যাপেটন মনসুর আলী সাহেবদের। উল্টে দিয়েছে ইতিহাসের চাকা, বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলেছে ছিনিমিনি। নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে হত্যা করা হয়েছে শত শত অফিসার এবং হাজার হাজার সৈনিককে।

আজকের বাংলাদেশে ইংরেজি এবং হিন্দির প্রভাবে বাংলা ভাষার নাভিশ্বাস, কিন্তু আমরা আশাবাদী। রম্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, মোগল পাঠানরা আমাদের ফার্সী শিখিয়েছে ৭০০ বছর ধরে কিন্তু ভুলতে লাগেনি একশো বছরও। আর আমরাতো উর্দু ভুলে গেছি এক প্রজন্মেই।

আমি আশাবাদী একারণেও যে, সম্প্রতি বিবিসির এক জরিপে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের তরুনরা তাদের আদর্শ হিসেবে দেখে কাজী নজরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই তরুনরাই খুনি স্বৈরশাসক আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়া এবং এরশাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় রক্ত দিয়েছে। এরাই এবার বুখে দাড়িয়েছে শাহবাগ চত্তরে, মৌলবাদের বিষদাত ভেঙে দেবার জন্য।

কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় আবার বলতে হয়: “জয় বাংলা, বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক”।

একুশের স্মৃতিকথা: প্রভাতফেরি

ফাতেমা খানম

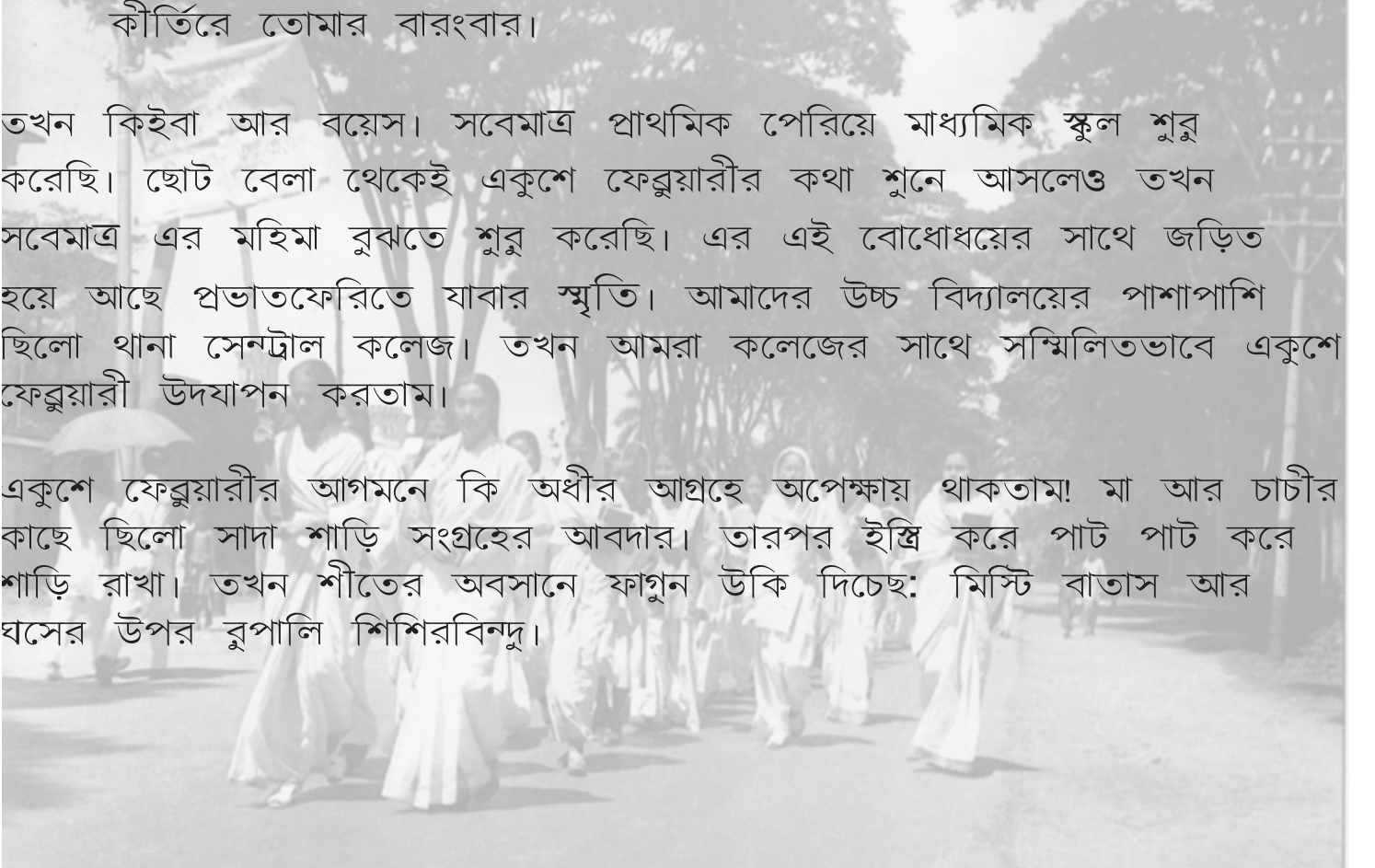
একুশে ফেব্রুয়ারী নিয়ে লিখতে গিয়ে একটি দুন্দ জাগছে মনে: ২১শে ফেব্রুয়ারী, না ৮ই ফাল্গুন? ২১শে ফেব্রুয়ারী সার্বজনীনভাবে শহীদ দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আবার এটা আনতর্যাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতও বটে। এখন ভাবতে খুব গর্ববোধ হয় যে, আমরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছি। অন্যদিকে, ৮ই ফাল্গুন বলতেই মনটা কেমন সতেজ হয়ে যায়। চোখে ভেসে আসে কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙ: রক্তে কেমন একটা সাহসী উদ্যম খেলে যায়।

এই দিনেইতো আমাদের সাহসী ছেলেরা মায়ের ভাষার মান রাখতে গিয়ে কার্ফু ভঙ্গ করে পুলিশের গুলিতে ঢাকার রাজপথ লাল করেছে: রফিক, সালাম, বরকত, জববার, শফিউর সহ আরো অনেকে। তাদের আত্মহুতিতে আমাদের চোখ ছলছল করে। কবির কলমে কবিতার ঝলক:

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ,
সম্মুখে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার বারংবার।

তখন কিইবা আর বয়েস। সবেমাত্র প্রাথমিক পেরিয়ে মাধ্যমিক স্কুল শুরু করেছি। ছোট বেলা থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা শুনে আসলেও তখন সবেমাত্র এর মহিমা বুঝতে শুরু করেছি। এর এই বোধোদয়ের সাথে জড়িত হয়ে আছে প্রভাতফেরিতে যাবার স্মৃতি। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ছিলো থানা সেন্ট্রাল কলেজ। তখন আমরা কলেজের সাথে সম্মিলিতভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করতাম।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আগমনে কি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম! মা আর চাচার কাছে ছিলো সাদা শাড়ি সংগ্রহের আবদার। তারপর ইস্ত্রি করে পাট পাট করে শাড়ি রাখা। তখন শীতের অবসানে ফাগুন উকি দিচ্ছে: মিস্টি বাতাস আর ঘসের উপর রুপালি শিশিরবিন্দু।



ক্যানসাস সিটির শহীদ মিনারের গল্প

আরিফ জোয়ার্দার

অনেক দিন হয়েছে বাংলা লেখার চর্চা নেই। তাই ভুল হলে ক্ষমা করবেন। বেশ অনেক বছর আগের কথা। একদিন লরেনস শহরে এক নৈশ ভোজে ডঃ আলমগীর নামে এক ভদ্রলোক বললেন, “আরিফ, আমি চিন্তা করছিলাম যে আমাদের কমিউনিটির জন্য একটা শহীদ মিনার দরকার। যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে।” আমি বললাম, “নিশ্চই। খুব সুন্দর আইডিয়া। আপনি চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি।” তিনি বললেন, “ঠিক আছে। তুমি যদি কর, তাহলে আমরা কমিউনিটি থেকে এটার খরচ দিতে পারি।”

বাসায় এসে আমি একটু চিন্তা করলাম। এ ধরনের হাতের কাজ আমি খুব কমই করেছি। কিন্তু শুধু ভাবলেই হবে না। কাউকে না কাউকে তো এটা করতে হবেই। হাতে সময় খুব কম। আর কিছুদিন পরেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান হবে BAGKC আর BSAKU এর যৌথ উদ্যোগে। আমি কাজ শুরু করলাম। ছবি থেকে দেখে আনুমানিক ভাবে মাপ নিলাম। শহীদ মিনারটি হতে হবে বড়, কিন্তু portable, যাতে গাড়িতে বহন করা যায়, আর খুব সহজে install করা যায়।

হোম ডিপো থেকে শহীদ মিনারের উপাদান কিনলাম। খরচ হয়েছিল খুব সামান্য। ১০০ ডলারের কম। আমার এক আমেরিকান বন্ধু সাহায্য করলো কিছু অংশ তৈরির জন্য, ওনার গ্যারেজের যন্ত্রপাতি দিয়ে। ওনাকে বুঝালাম যে এটা আমাদের বাঙ্গালি জাতির এক প্রতীক। লরেনস শহরে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে শহীদ মিনারটা ব্যবহার হল। আমার অনুভূতিটা বুঝাতে পারবো না। খুব ভাল লাগছিল যখন সবাই লাইন ধরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন, ঠিক যেভাবে আমরা দেশে এই দিনটা উদযাপন করি। ছোট শিশুরা দেখলো আমাদের সংস্কৃতি আর আমাদের ভাষার গর্ব।

এর পর আর কয়েকবার শহীদ মিনারটা ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রোগ্রামে ব্যবহার হয়েছে। ভেবেছিলাম যেহেতু আমাদের কমিউনিটির ব্যবহারের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে, আমাদের কমিউনিটিই এটার খরচ বহন করবে। তাহলে মনে হবে যে আমরা সবাই একত্রে কাজ করতে পারি। আমরা সবাই আমাদের ঐতিহ্যকে মূল্য দেই। আমরা সবাই ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে পারি।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার উপলব্ধি একটু বিপরীত। তবুও আমি খুশি যে আমার তৈরি শহীদ মিনারটা ব্যবহার করা হচ্ছে। শহীদ মিনারটা আমি BAGKC কে অনুদান দিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমার কামনা যে ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলেমিশে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করবো। আমার মনে হয় শহীদদের থেকে এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয়।

একুশের ছড়া

আতাউল করিম

বাঙলা যদি থাকতো আজও
পাকিস্তানের সাথে,
ওদের সহ তিরিশ কোটির
মরতে হতো ভাতে।

আর-কি হতো ভাবতে গেলে
আঁতকে উঠি ভয়ে,
এইতো সেদিন করাচিতে
মরলো শ'য়ে শ'য়ে।

পিন্ডিতে আজ ফাটলো বোমা,
ফাটবে কোথাও কালও,
অন্য দেশে পথের মানুষ
এরচে'থাকে ভালো।

বিশ্ব জুড়ে পাকিস্তানের
পরিচয়টাই ধরি,
একাত্তরটা না এলে তো
লজ্জাতে আজ মরি।

ভাগ্য আমার সালাম রফিক
জন্মেছিল দেশে,
গড়লো ওরা অমর একুশ
জীবন দিয়ে হেসে।

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ
প্রভাত ফেরীর গান,
একাত্তরতো বলতে গেলে
বায়ান্নরই দান।



গৌরবের মাসে বীরের গল্প

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ



শहीদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন

শहीদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন ১৯৪৩ সালের ২ আগস্ট টাংগাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাতা রাবেয়া খাতুন। তিনি লাহোর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস-সি অনার্স এবং এম.এস-সি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তদানীন্তন সিএসপি ১৯৬৭ ব্যাচের কর্মকর্তা আবুল কালাম শামসুদ্দিন ১৯৬৯ সালে সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন। সরকারি কর্মকর্তা হয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্দীপিত হয়ে সকল বাধা উপেক্ষা করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ সিরাজগঞ্জ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় স্বাধীনতার পক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ ব্যক্ত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করতে শहीদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন সিরাজগঞ্জ ছাড়াও পাবনা ও বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়িয়েছেন। কিশোর-তরুণ-যুবকদের নিয়ে তিনি প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

নগরবাড়ি হয়ে বাঘাবাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তিনি তাদের মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একজন সাধারণ যোদ্ধার মত বাজ্ঞারে অবস্থান করে প্রতিরোধ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাঁর এ ভূমিকা এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে সংগ্রাম করে গেলেও তিনি দেখে যেতে পারেননি দেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৯৭১ সালের ১৯ মে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তাঁর একমাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান ও চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ শहीদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন-কে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) ২০১২ প্রদান করা হল।

Ekushe February

By

Samiya Rasheed, 6th grade

A day of sorrow and joy
And the sun rises again
Celebrates death
And words then

February 21st
A day of our language
A war fought for us
Gives our country edge

